# সিঁদুর

**স্বরূপা রায়**

এক বছর ধরে প্রতীক্ষিত দুর্গাপূজা আজ আবার শুরু। আজ মহাষষ্ঠী। আজ থেকেই শুরু পাঁচদিন ব্যাপী বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই পাঁচদিন পরিবার আর বন্ধুবান্ধবের সাথে হইচই, প্রতিমা দর্শন, পাড়ার মন্ডপে সবাই মিলে বসে আড্ডা, অষ্টমীর ভোগ, বাকিদিন বাইরে খাওয়া, সব মিলিয়ে একদম জমজমাট ব্যাপার।

আর এবার তার সাথে আমার আরেকটা আকর্ষণ হলো, আমার ছোট্টবেলার বন্ধু দীনেশ বহু বছর বাদে কলকাতায় ফিরবে আজ।

দীনেশ শুধু আমার বন্ধুই ছিল না। ও আমার মায়ের বেস্টফ্রেন্ডের ছেলেও। আমাদের জন্ম প্রায় একই সময়। দীনেশ আমার থেকে দুই মাসের বড়। দুই বেস্টফ্রেন্ড মিলে প্ল্যান করেই আমাদের নাম রেখেছিল শিব-পার্বতীর নামানুসারে। দীনেশ হলো শিব ঠাকুরের আরেক নাম। আর আমার নাম গৌরি, যা দুর্গামায়ের আরেক নাম।

দীনেশ আর আমি নার্সারি থেকে একই স্কুলে পড়তাম। ছোট থেকেই আমরা আমাদের মায়েদের মতোই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। কিন্তু হঠাৎই যখন আমরা ক্লাস থ্রিতে, তখন একটা অ্যাক্সিডেন্টে দীনেশের বাবা-মা দুজনেই মারা যায়। একা দীনেশকে কে দেখবে এখানে, সেই ভেবে ওর কাকা ওকে নিয়ে চলে যায় নিজের বাড়ি হায়দ্রাবাদে। তারপর থেকে আর দেখা হয়নি ওর সাথে। আমাদের বয়স এখন একুশ। আজও আমাদের রোজ নিয়ম করে একবার ফোনে কথা হয়।

কয়েকদিন আগে হঠাৎই জানায় দীনেশ আমাকে যে ও কলকাতায় আসবে। এতদিন ওর কাকা ওকে একা আসতে অনুমতি দিতো না। কিন্তু এবার অনুমতি দিয়েছে। আজই সকালে ট্রেনে ওর নামার কথা। আমাদের বাড়িতেই থাকবে। আমরা ছাড়া এই কলকাতায় ওর আর কেউ নেই।

আমি সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠে স্নান, পূজা, খাওয়া সেড়েই বেড়িয়ে পড়লাম হাওড়ার উদ্দেশ্যে। দীনেশের ট্রেন দুপুর বারোটা নাগাদ হাওড়া ঢোকার কথা। আজকাল তো কলকাতায় সবাই ষষ্ঠীর দিন সকালেও পূজা দেখে, তাই রাস্তায় ভিষণ জ্যাম। লম্বা জ্যাম কাটিয়ে হাওড়া ঢুকতে আমার এগারোটা পঞ্চাশ বেজে গেলো। দীনেশকে ফোন করলাম,

-হ্যালো।

-কত দূর? আমি স্টেশনে এলাম।

-এই তো হাওড়া ঢুকছে।

-আচ্ছা।

আমি ফোন কেটে দশ থেকে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতেই দীনেশের ট্রেনটা এসে ঢুকলো প্ল্যাটফর্মে। অত্যধিক ভিড়ের মধ্যে আমি এদিকওদিক খুঁজছি দীনেশকে। এরমধ্যেই ও আমার পেছন দিক থেকে এসে আমার পিঠে চাপড় মারলো। আমি চাপড় খেয়ে তাকিয়ে দেখি দীনেশ। এত বছর বাদে ছোটবেলার প্রাণের বন্ধুকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে আমার যেন প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। আমরা দুজন দুজনকে পরম স্নেহে আলিঙ্গন করলাম।

তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন আছিস?"

"আমি তো বিন্দাস! তোর কথা বল।" দীনেশ বললো।

"আমি ভালোই ছিলাম। এখন আরোও ভালো আছি তোকে দেখতে পেয়ে। এবার তাড়াতাড়ি চল। মা যে অপেক্ষা করছে তোর।"

"হ্যাঁ চল। মাসিমুনির সাথে কত বছর বাদে দেখা হবে বল।"

"সেই তো! মা খুব উৎসুক তোকে দেখার জন্য।"

"আমিও।"

হাওড়ার বাইরে থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম বাড়িতে। মা দরজা খুলে দীনেশকে দেখেই খুব খুশি হয়ে গেল। দীনেশ মায়ের পায়ের হাত দিয়ে প্রণাম করতেই মা "থাক থাক" বলে ওকে জড়িয়ে ধরলো।

দীনেশের মধ্যে যেন মা নিজের চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়া প্রিয় বান্ধবীকে আজ খুঁজে পেয়েছে।

"কেমন আছিস বাবা?" মা জিজ্ঞেস করলো।

"খুব ভালো। তুমি কেমন আছো?" দীনেশ জিজ্ঞেস করলো।

"আমিও ভালো।" মা বলতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কি এখানে দাঁড়িয়েই সব কথা বলবে?"

"না, না ভেতরে আয় বাবা।" বলে মা দীনেশকে টানতে টানতে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল।

আমি তারপর দীনেশকে গেস্টরুমে নিয়ে গিয়ে বললাম, "এবার তুই ফ্রেশ হয়েনে। তারপর খেয়েদেয়ে একটু রেস্ট করিস। বিকেলে ঘুরতে বেরোবো।"

"রেস্ট আমার লাগবেনা। আমি আছিই কয়েকদিন। এই কদিন চুটিয়ে সবকিছু উপভোগ করবো। আর এই কদিন তোরও কোনো রেস্ট নেই। খেয়েদেয়ে আমরা গল্প করবো।" দীনেশ বলে গেল এক নাগাড়ে।

"ঠিক আছে।" বলে আমি চলে এলাম।

দুপুরে খেয়েদেয়ে আমি আর দীনেশ বসলাম দোতলার বারান্দায়। আমাদের বাড়ি থেকে দুটো বাড়ি পরেই একটা বড় পূজা হয়। তাই আমাদের রাস্তায় খুব ভিড়। পূজার কদিন বাড়ির রাস্তায় গাড়ি চলে না। আমাদের গাড়ি বের করতে হলে মন্ডপ সিকিউরিটিকে আগে থেকে বলে বের করতে লাগে। খুব ঝামেলা!

বারান্দায় বসেই দেখা যাচ্ছে পূজা মন্ডপের চূড়াটা। রাস্তা দিয়ে অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে। পড়ন্ত বিকেলের হাল্কা রোদে আর শরৎের হাওয়ায় পরিবেশটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। আর তার সাথে উপরি পাওনা, মন্ডপের মাইকে গান বাজছে,

"ওগো আমার আগমনী,

জ্বালো... প্রদীপ জ্বালো,

এই শরতেরও ঝঞ্জাবাতে,
নিশার শেষে রুদ্র'ভাতে,
নিভলো আমার পথের বাতি,
নিভলো প্রাণের আলো....."

এত সুন্দর পরিবেশে হঠাৎ একটা মন খারাপ করা কথা বলে বসলো দীনেশ, "মা-বাবার কথা খুব মনে পড়ছে রে।"

এই কথার আমি কি উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। তাই শুনেও চুপ করে থাকলাম।

দীনেশই আবার বললো, "আমার মনে আছে, প্রতি বছর বাবা আমাকে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পড়ার জন্য নতুন জামা কিনে দিতো। তার মধ্যে একটা সবসময় পাঞ্জাবী থাকতো অষ্টমীতে পড়ার জন্য। তার সাথে নতুন জুতো, ঘড়ি, টুপি, রোদ চশমাও থাকতো। বাবা চলে যাওয়ার পর কাকা আমাকে একটা নতুন জামা কিনে দিতো পূজার সময়। তাছাড়া সারা বছর জুটতো আমার থেকে দুই বছরের বড় খুড়তুতো দাদার ছোট হয়ে যাওয়া এবং পুরোনো জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিস। মা বেঁচে থাকতে অষ্টমীর দিন আমার নামে মা প্রতি বছর পূজা দিত, আমাকে অঞ্জলি দিতে নিয়ে যেত। কাকীমা তো আমাকে অত পছন্দই করেনা। পূজাপার্বণে আমাকে অত থাকতেও দেয়না।"

"তোর মনে আছে, নবমীর রাতে তুই, তোর বাবা-মা আর আমি, মা-বাবা সবাই ঠাকুর দেখতে বেরোতাম রাতে। কত আনন্দ হতো তখন। মাসিমুনি আর মেসো চলে গেল আর তারপর তুই কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে জানিস আমরা নবমীর দিন ঠাকুর দেখতে বেরোইনা।" আমি বললাম।

"কেনো?"

"আমাদের তোদের কথা খুব মনে পড়ে যে ওইদিন। সেই আনন্দ মুহূর্তগুলো যে আজও স্মৃতিপটে একেবারে অক্ষত রয়ে গেছে।"

"আর আমি তো সেই কলকাতা ছাড়ার পর থেকে দুর্গামায়ের মুখই দেখিনি।"

"তোদের ওখানে তো দুর্গাপূজা হয় কয়েকটা।"

"হ্যাঁ হয় তো। কাকা, কাকীমা আর দাদা যেত ঠাকুর দেখতে। কিন্তু আমাকে নিয়ে যেত না।"

"কেনো?"

"জানিনা রে।"

"ছাড়! এবার আমরা দেখবো কলকাতার সব বড় বড় ঠাকুর। আর এরপর থেকে চেষ্টা করবি প্রতি বছর পূজায় কলকাতা চলে আসতে। তাহলে সেই মজা হবে।"

"প্রতি বছরের চিন্তা পরে। আগে এই বছর আমাকে এন্টারটেইন কর ভালোমতো পূণ্য কামাতে হলে।" দীনেশের এই কথাটা আমাদের মনমরা কথোপকথনে প্রাণ ফিরিয়ে আনলো।

"পূণ্য তোকে এন্টারটেইন করে? দরকার নেই আমার ওরকম পূণ্যের।"

"অপদার্থ তুই একটা।"

"তুই অপদার্থ।"

"ঝগড়া না করে যা তৈরি হয়েনে। সাজতে তো দুই ঘন্টা লাগাবি। আমরা তাড়াতাড়ি বেরোবো।"

"আমার মোটেও সাজতে দুই ঘন্টা লাগেনা। আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাই।"

"উহ! দেখা যাবে। যা এখন।"

"হ্যাঁ যাই" বলে আমি তৈরি হতে চলে গেলাম।

মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যেবেলা আমি তৈরি হলাম একটা হলদে রংয়ের চুড়িদার পড়ে। চুলটা খোলাই রাখলাম। তার সাথে চোখে অল্প কাজল আর ঠোঁটে অল্প লিপস্টিক।

লিপস্টিকটা লাগাচ্ছি, এমন সময় আমার ঘরের দরজায় কে যেন কড়া নাড়লো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কে?"

দরজার বাইরে থেকে গলা ভেসে এলো, "আমি।", দীনেশের গলা।

"ভেতরে আয়।" আমি বললাম।

দীনেশ দরজা খুলে ভেতরে আসতেই আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন লাগছে আমাকে?"

দীনেশ আমাকে ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করে বললো, "ভালো লাগছে কিন্তু একটা জিনিস মিসিং।"

"কি মিসিং?" আমি জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে।

দীনেশ আমাকে কিছু না বলে আমার ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে কিছু একটা খুঁজতে লাগলো। কিছুক্ষণের খোঁজা পর্ব শেষ করে একটা কালো টিপের পাতা হাতে নিয়ে সেটা থেকে একটা টিপ খুলে আমার কপালে লাগিয়ে দিয়ে বললো, "এই নে, এবার একদম ঠিক আছে। এখন দারুন লাগছে তোকে দেখতে।"

"পাগল" বলে মুচকি হাসলাম আমি।

উত্তর কলকাতার সব বড় বড় পূজা মন্ডপ, যেমন, শোভাবাজার রাজবাড়ি, শ্রীভূমি, শিকদার বাগান, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, পাইকপাড়া, নলিনী সরকার স্ট্রিট, মহম্মদ আলি পার্ক, হাতিবাগান, কলেজ স্কোয়ার, বাগবাজাত সার্বজনীন দেখে বাড়ি ফিরলাম রাত এগারোটায়। বাবার আজ অফিস ছুটি নেই। তাই মাও আজ বেরোয়নি। তাই আমি আর দীনেশই ঘুরে এলাম।

রাতের দীনেশের প্রিয় পদ হিসেবে মা রান্না করেছে সজনেডাঁটার শুক্তো আর পটলের দোরমা। দীনেশ বহু বছর বাদে ওর এই প্রিয় দুটো পদ এত তৃপ্তি করে খেতে পেরে খুবই খুশি হলো।

পরেরদিন, অর্থাৎ সপ্তমীর সকালে তাড়াতাড়ি উঠে স্নান-খাওয়া সেড়ে আমি আর দীনেশ চলে এলাম পাড়ার মন্ডপে। সপ্তমীর পূজা চলছে। আজ আমার বর্তমানের বন্ধবান্ধবীদের সবার এখানে আসার কথা। একসাথে সবাই মিলে আড্ডা মারার প্ল্যান আমাদের। আমি আর দীনেশ গিয়ে দুর্গামাকে প্রণাম করে দুটো চেয়ার টেনে বসতেই চলে এলো আমার সব বন্ধুরা, দেব, তিথি, বিক্রম, সজল, রাকেশ, প্রণতি, প্রিয়াঙ্কা। আমি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম দীনেশের।

আমরা সবাই মিলে গল্প করছি, এমন সময় তিথি দেখি দীনেশের দিকে অপলকে দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এটা শুধু আমিই দেখিনি। সবাই লক্ষ্য করেছে, দীনেশ বাদে। বিক্রম তো জিজ্ঞেসই করে বসলো তিথিকে, "কি রে তিথি, দীনেশের দিকে ওভাবে তাকিয়ে কি দেখছিস?"

তিথি প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণভাবে উত্তর দিল, "প্রথম এত সুদর্শন ছেলে দেখলাম। তাই চোখ সরাতে পারছিনা।"

এটা শুনে দীনেশ অস্বস্তি ভঙ্গিমায় আমার দিকে তাকালো। কথাটা আমারও ভালো লাগলো না। আমি বলেই দিলাম, "আমার বন্ধুর দিকে নজর দিস না।"

সাথে সাথে তিথি খিমচি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কেনো রে? তুই ওর সাথে প্রেম করবি ঠিক করে রেখেছিস নাকি?"

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। আমি ক্ষেপে গেছি বুঝতে পেরে দীনেশ আমার হাতে ওর হাত দিয়ে চেপে পরিস্থিতি সামলে বললো, "উফ! তোরা না সত্যি। বড্ড ঝগড়া করিস। ওই যে পূজা শেষ, প্রসাদ দিচ্ছে। সবাই চল প্রসাদ নিয়ে আসি।"

আমরা সবাই প্রসাদ নিয়ে বাইরেই একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। খেয়েদেয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে বিছানায় বসেছি, এমন সময় দীনেশ এলো আমার ঘরে।

"কি রে আর বেরোবি না?" দীনেশ জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

"খুব ক্লান্ত লাগছে রে।" আমি বললাম।

"মাসিমুনিরা বেরোবে বললো যে।"

"হ্যাঁ বেরোবে। তুই চলে যা মাদের সাথে। আমি বাড়িতেই থাকি। কাল আবার বেরোবো।"

"তুই না গেলে আমিও যাবো না।"

"আমি তো প্রতি বছর ঠাকুর দেখি। একদিন না বেরোলেও কিচ্ছুনা। তুই আবার পরের বছর আসবি কিনা তার ঠিক নেই। তুই যা ঘুরে আয়।"

"বেশি কথা বলিস না। মাসিমুনি আর মেসো যাক। তুই আর আমি বাড়িতেই আড্ডা দিই।"

দীনেশ যাবেই না আমাকে ছাড়া বুঝতে পেরে অগত্যা বললাম, "ঠিক আছে।"

মা-বাবা প্রতিমা দর্শনে বেড়িয়ে গেলে ঝুড়িভাজা, পেঁয়াজ আর সর্ষের তেল দিয়ে মাখা মুড়ি নিয়ে বসলাম আমি আর দীনেশ।

টুকটাক ভুলভাল কথাবার্তা মাঝে দীনেশ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "আজকে সকালে ওরকম রেগে গেছিলি কেনো?"

দীনেশ কোন সময়ের কথা বলছে বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে জিজ্ঞেস করলাম, "কখন?"

"ওই যে তিথি যখন আমাকে সুদর্শন বললো।"

"রাগলাম কোথায়?"

"রাগ না তো কি ছিল? আমি না থামালে তো ঝগড়া লাগিয়ে দিতি।"

"তোর মাথা।"

"আমাকে ও সুদর্শন বলেছিল জন্য জ্বলন হচ্ছিলো?"

"আমার জ্বলন হবে কেনো? কি আশ্চর্য!"

"তাও ঠিক। আমি তোর হই-ই বা কে!"

"ফালতু বকিস না তো!"

"আচ্ছা তোর আজ অবধি কোনো ছেলেকে ভালোলাগেনি?"

"হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"তোর অসুবিধা হচ্ছে?"

"আরে সেটা না। কিন্তু এই সময় এরকম প্রশ্ন শুনে অবাক হলাম।"

"তুই উত্তর দে আমার প্রশ্নের।"

"হ্যাঁ ভালো লেগেছিল একজনকে। বলতে গেলে ভালোলাগে তাকে এখনো।"

"কে সে? আমাকে তো আগে কোনোদিন বলিসনি।"

"আছা একজন, তুই চিনবি না।"

"বল না কে সে?"

"তার আগে তুই বল, তোর কাউকে ভালোলাগেনা?"

"আমার ভালোলাগেনা। আমি ভালোবাসি একজনকে।"

"কি? তুই ভালোবাসিস? আমাকে তো বলিসনি।"

"তুইও তো বলিসনি। তাই আমিও বলিনি।"

"কে সে?"

"যদি বলি, তুই?"

"দীনেশ ইয়ার্কি মারিস না।"

"সত্যি বলছি।" বলে দীনেশ আমার হাতটা চেপে ধরলো ওর হাত দিয়ে। তারপর বললো, "তোকে আমি ভালোবাসি গৌরি। আর আমি এটাও জানি যে, আমাকে তুইও ভালোবাসিস।"

"তুই কিভাবে জানলি?" আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করলাম।

"তোর কথা, তোর চোখ দেখে বোঝা যায়। আর আজ তোর তিথির প্রেমের ইঙ্গিতে ওভাবে সাড়া দেওয়ায় আরোও নিশ্চিত হয়ে গেছিলাম।"

আমি আরোও লজ্জা পেয়ে গেলাম। হাতটা ছাড়িয়ে বারান্দার খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দীনেশ আসতে আসতে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। ওর প্রতিটা নিশ্বাস পড়ছে আমার কানের কাছে। আমি চোখ বন্ধ করে সেটা অনুভব করছি। দীনেশ আমার কানে কানে বললো,

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার,
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার-
কত রূপ ধ'রে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।"

রবিঠাকুরের এই "অনন্ত প্রেম" কবিতাটা দীনেশের মুখে শুনে আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। পেছন ফিরে জড়িয়ে ধরলাম দীনেশকে। ওউ ওর সমস্ত আদর, ভালোবাসা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

তারপর দুজনে মা-বাবা না ফেরা পর্যন্ত একে অপরের হাতে হাত রেখে অনেক না বলা গল্পগুলো করলাম। মা আমাদের জন্য খাওয়ার বানিয়ে রেখে গেছিলো। নিজে হাতে আজ আমি ওকে খাইয়ে দিলাম।

চলে এলো দুর্গাপূজার সব থেকে বড়দিন, মহাষ্টমী। গতকাল রাতে খুশির আমেজে ভালো ঘুম হয়নি। ভোরবেলা উঠে তাড়াতাড়ি স্নান করে তৈরি হয়ে নিলাম। আমি একটা লাল জামদানি পড়লাম। চুলটায় খোঁপা করে বেলিফুলের মালা লাগালাম। চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক আর কপালে লাল টিপ দিয়ে আমি একদম তৈরি।

তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে আসতেই দীনেশ আমার সামনে। আমাকে দেখে ও ওর চোখের পলক ফেলতে পারলো না। ওকেও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। ও পড়েছে একটা হলুদ পাঞ্জাবী।

আমাদের দুজনকে একসাথে দেখে বাবা বললো, "তোদের তো আজ সত্যি শিব-পার্বতী লাগছে রে। তোদের মায়েদের রাখা নামটা আজ সার্থক।"

এটা শুনে আমি আর দীনেশ দুজনেই লজ্জায় মাথা নিচু করলাম হেসে।

তারপর আমি, দীনেশ, মা আর বাবা সবাই মিলে গেলাম পাড়ার মন্ডপে অঞ্জলি দিতে। মায়ের কথামতো অবিবাহিতা মেয়ে হিসেবে শাড়ির আঁচলের চওড়া দিকটা মাথায় দিয়ে অঞ্জলি দিলাম দুর্গামায়ের নামে।

অঞ্জলি দেওয়ার পর দীনেশ জিজ্ঞেস করলো, "ঘুরতে যাবি?"

"কিছু তো খাইনি আমরা। বাড়ি চল, খেয়ে বেরোই।" আমি বললাম।

"বাইরে খেয়ে নেবো। চল না।"

"আচ্ছা চল।"

আমরা দুজন মা-বাবাকে জানিয়ে বেড়িয়ে গেলাম। একটা দোকান থেকে পুরি-তরকারি খেয়ে চললাম ঠাকুর দর্শন করতে। বিখ্যাত পূজা ত্রিধারা সম্মেলনী, সংহী পার্ক, সেলিম পল্লী, যোধপুর পার্ক, হিন্দুস্থান ক্লাব, ফাল্গুনী সংঘ, একডালিয়া এভারগ্রিন আর বাবুবাগানের পূজা দেখলাম আমরা একে অপরের হাত ধরে। দুপুরে যোধপুর পার্কের পূজায় ভোগ বিতরণ হচ্ছিলো, সেটাই খেয়ে নিয়েছি। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম বিকেল পাঁচটায়।

কিছুক্ষণ রেস্ট করে আবার আমরা সবাই বেরোলাম। আজ রাত আটটা থেকে পাড়ার মন্ডপে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হবে। মা শঙ্খ বাজানো প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে দ্বিতীয় হয়ে ধুপদানি প্রাইজ পেল। আমি মোমবাতি জ্বালানো আর পূজোর থালা সাজানোতে ক্রমে প্রথম আর দ্বিতীয় হয়ে পাথরের বাটি আর পেতলের ছোট গ্লাস পেলাম। আমি জোর করে ঢাক বাজানোতে নাম দেওয়ালাম দীনেশকে। আমার উপর রীতিমতো রেগে নাম দিয়ে প্রথম হয়ে একটা পেতলের থালা পাওয়ার পর ছেলে খুশি। বাবাও নাম দিয়েছিল ধুনুচি নাচে কিন্তু কোনো প্রাইজ পেল না। রাতে ক্লান্ত হয়ে আমরা সবাই বাড়ি ফিরে এসে খেয়েই শুয়ে পড়লাম।

অবশেষে, মায়ের আরাধনার শেষ দিন। আজ মহানবমী। দীনেশ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল যে ওরা দুজনে মিলে ঘুরতে যাবে অন্য কোথাও আজ বিকেলবেলা। একটু নিরিবিলিতে কোথাও একটা বিকেলটা দুজনে কাটাবে একান্তে।

সকালবেলাটা মন্ডপেই কাটিয়ে বিকেলবেলা তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে গেলাম আমি আর দীনেশ। বাবুঘাটে এসে বসলাম দুজনে পাশাপাশি। দুজন দুজনের হাতে হাত রেখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছি নিস্তব্দে। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দীনেশ বললো, "তোকে আজ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সত্য বলবো আমার জীবনের।"

"তোর জীবনের সত্য? মানে?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ আমার জীবনের কঠিন সত্য। যেটা শোনার জন্য তোকে নিজেকে শক্ত রাখতে হবে।"

"আমার ভয় করছে দীনেশ। তুই তাড়াতাড়ি বল তো।"

"আমি ক্যান্সারে আক্রান্ত।"

এটা শুনে আমার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। আমার গলাটা ভারী হয়ে আসলো। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "কি বলছিস?"

"হ্যাঁ রে সত্যি বলছি। তিন মাস আগে আমার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। একদম মৃত্যুর পথে চলে না এলেও আমার চিকিৎসা দরকার। যেটার জন্য টাকা নেই আমার কাছে। তাই ডাক্তার বলেছেন, চিকিৎসা ছাড়া থাকলে আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না। আমি তোকে অনেকদিন ধরেই ভালোবাসি। ভেবেছিলাম চাকরি পেয়ে কলকাতা ফিরে তোকে এসে মনের কথা বলে একেবারে বিয়ে করে নেবো। কিন্তু এই মারণ রোগ সেই দিনটা আমাকে দেখতে দেবে না। তো ভাবলাম মনের কথা না তোকে না জানিয়ে মরে গেলে আমার আত্মাও শান্তি পাবেনা। তাই এবার দুর্গাপূজায় চলে এলাম তোর কাছে, জানিয়েই দিলাম তোকে আমার মনের কথা। আমাকে মাফ করিস গৌরি। তোকে হয়তো খুব কষ্ট দিলাম।"

সব শুনে আমার দুই গাল বেয়ে চোখ থেকে জল নেমে এলো। দীনেশকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "তুই আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবিনা, আমি বলে দিলাম।"

তারপর আমাদের গলা দিয়ে আর কোনো কথা বেরোলো না। আমি দীনেশের বুকে মাথা রেখে কেঁদেই গেলাম।

রাতে ঘুম হলো না আমার। আজ বিজয়া দশমী। দুর্গামায়ের আজ বিদায়ের পালা। সকালে উঠে স্নান করে মায়ের সাথে মন্ডপে গেলাম সিঁদুর ছোঁয়াতে। আমি আর মা সিঁদুর ছোঁয়ানোর পর যখন মা সিঁদুর খেলতে ব্যস্ত তখন আমি চলে এলাম বাড়িতে। দীনেশ একাই আছে বাড়িতে। বাবাও মন্ডপেই আছে।

আমি বাড়িতে এসে দীনেশের কাছে গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর কাছে কোনোদিন কিচ্ছু চাইনি আমি। আজ একটা জিনিস চাইবো। আমাকে দিবি?"

"কি?" দীনেশ আমাকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"আজ আমাকে সিঁদুর পড়িয়ে পুরোপুরি নিজের করে নিতে পারবি?"

"তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? সবটা জেনেও নিজের জীবনটা কেনো নষ্ট করতে চাইছিস?"

"মা বলে সিঁদুরের নাকি অনেক শক্তি। আজকের দিনে দুর্গামাকে সিঁদুর পড়িয়ে নিজের সিঁদুরের শক্তি বাড়িয়ে তোলে বউরা। আমিও আজ তোর হাতে সিঁদুর পড়তে চাই তোর দীর্ঘায়ু জীবনের জন্য।"

"আমার জীবন আর দীর্ঘায়ু হবেনা রে।"

"একটাবার শেষ চেষ্টাই করে দেখ না রে। আমার জন্য প্লিজ।"

দীনেশ আর কিছু না ভেবে আমার সিঁথি ভরিয়ে দিল আমার হাতের থালা থেকে সিঁদুর নিয়ে। আমি চোখ ভর্তি জল নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম দীনেশকে।

বিকালে মন্ডপের ঠাকুর বিসর্জনের জন্য চলে গেলে আমাকে দীনেশ বললো, "আমি কাল চলে যাবো হায়দ্রাবাদ।"

"কিসের জন্য?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ফিরতে হবে রে আমাকে।"

"নাহ! আমি মা-বাবাকে তোর কথা আজ জানাবো। তুই এখানেই থাকবি। আমরা তোর চিকিৎসা করিয়ে তোকে সুস্থ করে তুলবো।"

"তুই পাগলের প্রলাপ বকিস না গৌরি।"

"আমি সত্যি বলছি। বাড়িতে চল।"

তারপর আমি বাবা-মাকে সব জানালাম। মা তো সব শুনে অঝোরে কেঁদে ফেললো। বাবা বললো, "আমাকে আগে জানাসনি কেনো? তোর বাবা যেদিন মারা গেল সেদিনই তোকে আমি বলেছিলাম যে আমি আজ থেকে তোর বাবা। মন থেকে মানতে পারিসনি না?"

এটা শুনে দীনেশ কিছু বলতে যাচ্ছিলো। বাবা আবার বাঁধা দিয়ে বললো, "তুই এখানেই থাকবি আজ থেকে। আমি তোর কাকার সাথে কথা বলে নেবো। আর তোকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্বও আমার।"

আজ সেদিনটার পরে চার বছর কেটে গেছে। এই চার বছর ধরে আমার সিঁথির সিঁদুর রক্ষা করেছে দীনেশকে। শুধু রক্ষাই না, ওকে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতিও দিয়েছে। আজ আর দীনেশের শরীরে একটাও ক্যান্সার সেল নেই।

আজ আমাদের বিয়ে সামাজিক মতে। সেদিনের সিঁদুর পড়ানোর কথাটা আমি আর দীনেশ বাদে কেউ জানেনা। কিন্তু আমাদের কাছে আমাদের বিয়ের দিন ওটাই। কারণ সেদিনই আমার সিঁথি রাঙা হয়েছিল দীনেশের পড়ানো সিঁদুরে।